তাওবাহ কেন করব
কিভাবে করব
মুহাম্মদ আবদুর রহমান খন্দকার

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْ نَنَّ مِنَ الْخَا سِرِيْنَ ـ

'হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি। যদি তুমি মাফ না কর এবং দয়া না কর তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হব।' (আল কুরআন)

তাওবাহ্ কেন করব কি ভাবে করব

মুহাম্মদ আবদুর রহমান খন্দকার

এম. এম. বি, এ, (সম্মান) এম, এ

ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স,

হায়দরাবাদ, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

মোবাইল ঃ ০১৫৫৬ ৩৩৬৭৩৮. ০১৭২৭ ৬৫০০০২

প্রকাশনায়

ঝিমঝিম প্রকাশনী

বুক্‌স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫ বাংলাবাজার, (তৃতীয় তলা)
ঢাকা-১১০০।

কুষ্টিয়া ঃ
বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন,
বটতৈল, বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া।

মোবাইল ঃ ০১৭৩১-২৩১০৩১, ০১৫৫৩-৬২৩১১৮

পরিবেশনায়

প্রফেসরস পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার,
ঢাকা-১২১৭
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১২৮৫৮৬

প্রফেসরস বুক কর্ণার
১৯১ ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার,
ঢাকা-১২১৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৬৭৭৭৫৪

তাওবাহ্ কেন করব, কি ভাবে করব

মুহাম্মদ আবদুর রহমান খন্দকার

প্রকাশক :
আবদুল কুদ্দুস সাদী
রিমঝিম প্রকাশনী
৪৫, বাংলাবাজার (৩য় তলা)
ঢাকা- ১১০০।

প্রকাশ কাল :
প্রথম প্রকাশ ঃ রমজান ২০১০ইং

কম্পোজ :
আবরার কম্পিউটার,
১৩, বাংলাবাজার (দ্বিতীয় তলা)
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে :
মশিউর রহমান

মুদ্রণে :
আল ফয়সাল প্রিন্টার্স
৩৪, শ্রীসদাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র।

Published By : Abdul Kuddus Sadi, Rimzim Prokashoni, 45, Banglabazar, Dhaka 1100.

সূচীপত্র

হযরত মুহাম্মদ (স) ইরশাদ করেন : "যে ব্যক্তি রাত্রিকালে পাপে লিপ্ত হয় তার পাপ ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ্ পাক হস্ত প্রসারিত করে তাকে সমস্ত দিন ডাকতে থাকেন। আর দিবাভাগে যে ব্যক্তি পাপ করে তাকে সারারাত ধরে ডাকতে থাকেন। এভাবে মাগরিব থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ্র ডাক অব্যাহত থাকে।" (আল হাদীস)

তাওবাহ্ কেন করব

তওবা অর্থ গুনাহ্ হতে প্রত্যাবর্তন বা ফিরে আসা। আখিরাতের মুক্তি লাভের উপাগুলোর মধ্যে তওবা প্রধান অবলম্বন। কি শরীয়ত কি তরিকত সবক্ষেত্রেই তওবা প্রয়োজন রয়েছে। গুনাহখাতার ক্ষেত্রে তওবাই হল প্রথম প্রধান উসিলা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বারবার বান্দাহকে গুনাহখাতার ক্ষেত্রে তওবার রাস্তা প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং তা শরীয়তের স্বীকৃত এবং নির্দেশিত ব্যবস্থা। অর্থাৎ তরিকতের রাস্তা এখতিয়ার করতে হলেও তরিকতপন্থীকে সর্বপ্রথম তওবার মধ্যে সে পথে প্রবেশ করতে হবে।

মানুষমাত্রই আল্লাহর দরবারে গুনাহের জন্য লজ্জিত এবং অপরাধী। অবশ্য নবীগণ আল্লাহর দরবারে বে-গুনাহ্। মানুষমাত্রই গুনাহে পতিত হয়ে থাকে। গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে শাস্তি অবধারিত। তবে তওবা দ্বারা সেই গুনাহ্ হতে মুক্তি ও অব্যাহতি প্রার্থনা করতে হবে।

সর্বদা গুনাহে ডুবে থাকা শয়তানের স্বাভাব। হযরত আদম (আ) মানবজাতির আদি পিতা। তিনিও আল্লাহর দরবারে কঠিন গুনাহ্ করেছিলেন। সেই গুনাহ্ হতে মুক্তি লাভের জন্য দীর্ঘ দিন অতি করুণভাবে তওবা করেছেন। সে তওবার কলেমা হচ্ছে এই :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

অর্থাৎ, ঃ 'হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি। যদি তুমি মাফ না কর এবং দয়া না কর তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হব।'

হযরত আদম (আ)-এর এ তওবা তার আওলাদগণের জন্য একটি আদর্শ, একটি সবক। অর্থাৎ গুনাহ্ ও আল্লাহর হুকুমের অবমাননা ও নাফরমানীর ক্ষেত্রে তওবা করা বনী আদমেরই তরীকা।

অপরপক্ষে তওবা না করা হলো শয়তানের স্বভাব। কারণ শয়তান আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী তো করলই, অধিকন্তু সে অহংকার বসে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকার করল। পরিণামে সে চির ঘৃণিত এবং আল্লাহর দরবার হতে বিতারিত হল।

মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালা "আশরাফুল মাখলুকাত" বা সেরা সৃষ্টি হিসাবে পয়দা করেছেন। তার একটি পরিচয় হল তার বিনয় ও নম্রতা এবং আল্লাহর দরবারে নিজ সৃষ্টি ও গুনাহ্ স্বীকার এবং ক্ষমা প্রার্থনা। মানুষের কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার জালে জড়িয়ে পড়ে আল্লাহর নির্ধারিত রাস্তা

হতে বিচ্যুত হয়, তখন আল্লাহর ক্ষমার দ্বারা তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন যাতে সে তওবা করে ভ্রান্তপথ হতে উদ্ধার হতে পারে।

সুতরাং গুনাহ হতে রক্ষা পাবার এবং আল্লাহর রহমত ও করুণা লাভ করবার পক্ষে তওবা একটি প্রধান বরং সর্বোত্তম উপায়। মানুষ যখন খালেসভাবে আল্লাহর দরবারে তওবা করে, তখন তার মানসিক কুপ্রবৃত্তিগুলো দমন হয় এবং শয়তান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় শরীয়তের পথ তার জন্য উন্মুক্ত সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তার মনের ক্লেদ দূর হয়, লজ্জা অনুতাপ সৃষ্টি হয়। ফলে তার পক্ষেও গুনাহের রাস্তা পরিত্যাগ করে নেকীর রাস্তায় অগ্রসর হতে থাকে।

তওবার সুফল সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেছেন :

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا - اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা হাসিল করতে পার।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, সকালবেলা তওবা করা উত্তম। গুনাহ করে লজ্জিত হওয়া এবং মনে মনে অনুতাপ করাও তওবার শামিল। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, আমি প্রত্যেহ সত্তর বার তওবা করে থাকি।

তওবাকারীর গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে থাকেন। যারা তওবা করে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেন। যারা দিনের গুনাহখাতা ক্ষমার জন্য রাত্রিতে তওবা করে আল্লাহ তাদের জন্য রহমতের দরজা খোলা রাখেন।

জানা দরকার যে সকলেরই গুনাহখাতা হয়ে থাকে। তবে যারা আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তারাই উত্তম। কেননা, তওবা এমনই একটি কাজ যার কল্যাণে মানুষ গুনাহ হতে সম্যকভাবে মুক্তি লাভ করে একেবারে বেগুনাহ হয়ে যায়। তওবার উপর কায়েম থাকার জন্য আল্লাহর নিকট সকাতরে প্রার্থনা করা উচিত। তবে যত গুনাহ হোক না কেন আল্লাহ তায়ালা তার দুর্বল প্রকৃতির বান্দাহর জন্য এত বড় ক্ষমা ও রহমতের ঘোষণা রেখেছেন, তথাপি যারা এর প্রতি কর্ণপাত না করে এবং গুনাহ হওয়ামাত্র তওবা করতে শিথিলতা করে বা ভুলে যায় তারা নিতান্তই হতভাগ্য।

হাদীস শরীফে লিখিত রয়েছে, গুনাহ করার পর যে বান্দাহ তওবা করবার পূর্বে মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, আসমানে এক বিশাল দরজা রয়েছে। তা তওবা ইস্তেগফারকারীদের জন্য সর্বদা খোলা থাকে। সোমবার ও বৃহস্পতিবার

দুনিয়াবাসীর আমল আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হয়। এদের মধ্যে যারা তওবা হতে বিমুখ তাদের গুনাহ বহাল থাকে।

হাদীসে শরীফে উল্লেখ রয়েছে, ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে নি:সম্বল অবস্থায় হারানো উট ফিরে পেলে লোকে যেরূপ খুশি হয়, কেউ তওবা করে আল্লাহর দিকে রুজু হলে আল্লাহ তদ্রূপ খুশি হয়ে থাকেন।

হযরত হামযা (রা)। হযরত মুহাম্মদ (সা) এর চাচা। তাঁকে হত্যা করেছিলেন হযরত ওয়াহশী (রা)। তখন তিনি ছিলেন অমুসলিম। নবীজীর চাচা হত্যাকারী এই হযরত ওয়াহশী (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে চিঠি লিখলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) এর কাছে; চিঠিতে লিখলেন : আমি তো মুসলমান হতে চাই। কিন্তু নিচের এই আয়াতটি আমার ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে আছে।

যারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ মানে না, অন্য কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না (তারা নেককার), আর যারা এসব কাজ করে তারা হলো গোনাহগার।

হযরত ওয়াহশী (রা) বলেন : আমি তো উপরের আয়াতে উল্লেখিত তিনটি কাজের সবকটিই করেছি। আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যেও কি তাওবার কোন সুযোগ আছে?

হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত ওয়াহশী (রা)-এর চিঠির জবাবে এই আয়াতটিই লিখে পাঠালেন। চিঠি পেলেন হযরত ওয়াহশী (রা)। পড়লেন। দেখলেন এই আয়াতেও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ...এবং সৎকাজ করে। মানে শুধু তাওবাহ করলেই হবে না, ঈমান আনলেই হবে না, এর পাশাপাশি সৎকাজও করতে হবে। বিষয়টা নিয়ে তিনি ভাবলেন। ভাবলেন, আমি ঈমান আনলাম, তাওবাহ করলাম, কিন্তু আমার তো জানা নেই, আমি সৎকাজ করতে পারব কি না। তাই এসব কিছু জানিয়ে আবারো চিঠি পাঠালেন নবীজীর দরবারে। এমন সময় অবতীর্ণ হয় নিচের এই আয়াতটি। আল্লাহ বলেন : আল্লাহপাক শিরক (এর গোনাহ) ক্ষমা করেন না, এছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত ওয়াহশী (রা)-কে এই আয়াতখানা লেখে পাঠালেন। পড়লেন হযরত ওয়াহশী (রা)। দেখলেন, এই আয়াতেও বলা হয়েছে, ক্ষমা করা না করা আল্লাহপাকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তাই তিনি আবারো চিঠি পাঠালেন, লেখলেন, আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যে আল্লাহপাকের ইচ্ছা হবে কি না তাতো আমার জানা নেই! তখন অবতীর্ণ হলো নিচের এই আয়াতখানা। আল্লাহপাক বলেন : (হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, হে আমার গোনাহগার

বান্দারা! তোমরা আল্লাহপাকের রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহপাক তোমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এরপর হযরত ওয়াহশী (রা) মদীনায় হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের গোনাহগুলো মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তওবার পরিচয় ও পদ্ধতি

মানুষ যখন কোন গোনাহ করে তখন তার বিরুদ্ধে চারটি জিনিস সাক্ষী হয়ে যায়। যথা :

ঘটনাস্থল : যে স্থানে গোনাহ করা হয় তা ঐ গোনাহ্র সাক্ষী হয়ে যায়, আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে বলেন : "সেই দিন (রোজ কিয়ামতে) যমীন তার খবরগুলো বর্ণনা করবে।"

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জমিনের পিঠের উপর যে কাজগুলো করা হয় জমিন সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ : এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন :

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

অর্থাৎ : (কিয়ামতের) এ দিনে আমরা তাদের মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেব, তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে যা তারা (দুনিয়ার জীবনে) করেছে। (সূরা : ইয়াসীন)

হযরত মাওলানা রুমী (র) বলেন :"চক্ষু সাক্ষ্য দিবে। হে আল্লাহ, আমার দ্বারা সে হারাম কাজ করেছে, কুদৃষ্টি দিয়েছে।" "কান বলবে : আমি পরনিন্দা ও গান-বাজনা শ্রবণ করেছি।" "ঠোঁট সাক্ষ্য দিবে : আমি হারাম স্থানে চুম্বন করেছি এবং এরূপ অপরাধে লিপ্ত হয়েছি। "হস্ত বলবে : আমি এ ভাবে ধন সম্পদ চুরি করেছি। এভাবে নেক আমলেরও সাক্ষী তৈরি হতে পারে, যেমন আরাফাত, মুজদালিফা ইত্যাদি স্থানে যে সকল নেক আমল করা হচ্ছে তারও সাক্ষ্য দাতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

আমল লেখক সম্মানিত ফেরেশতামণ্ডলী : আল্লাহ পাক এদের সম্পর্কে বলেন :"কেরামান কাতেবীন (আমল লেখক ফেরেশতাগণ) তোমরা যা কিছু করছ তা অবগত আছেন।"

বান্দার আমলনামা (বা ছহীফা) : এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : "আর (বান্দার কৃতকার্য জানা যাবে) যখন আমল নামগুলো খুলে দেওয়া হবে।"

আল্লামা নববীর শরহে মুসলিম গ্রন্থে বলা হয়েছে : হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, সাক্ষ্যদানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বান্দা যদি তার গোনাহ থেকে তওবা করে তা হলে আল্লাহ তার ভয়ের কারণ থাকবে না। তবে তওবা কবুল হওয়ার জন্য চারটি কাজ রয়েছে। তাদের তিনটি রয়েছে আল্লাহ্র হক পর্যায়ে এবং অবশিষ্ট ১টি রয়েছে বান্দার হকের পর্যায়ে।

তওবার অপরিহার্যতা

তওবা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। কে এমন বান্দাহ রয়েছে যে, আল্লাহর দরবারে দায়ী এবং লজ্জিত নয়? কাফির তার কুফরী হতে, মুশরিক তার শির্কী হতে এবং গুনাহর দরিয়ায় নিমজ্জমান ব্যক্তি সম্মান লাভের জন্য একমাত্র তওবার মাধ্যমে। ভ্রান্তপথ ও অন্যায় কাজ হতে সজাগ হয়ে সত্য ও ন্যায়ের রাস্তা গ্রহণ করবার সংকল্পের কাজ তওবা দ্বারাই হয়ে থাকে।

তওবার করা ফরয

শির্কী এবং কুফরী হতে অবিলম্বে তওবা করা ফরয। অত:পর প্রত্যেক গুনাহখাতা ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং বাতিল আকীদা হতে তওবা করবে। এ জাহেরী ঈমান ও আকীদার বিষয় ঠিক হয়ে গেলে বাতেনী বিষয়ে তওবা করবে। বাতেনী বিষয় যথা, নফ্সের ক্ষতিকারক বিষয়গুলো লোভ-লালসা, কাম-ক্রোধ ইত্যাদি। এ সকল মানসিক কুপ্রবৃত্তিগুলো সব গুনাহের মূল। এ রিপুগুলো ইন্দ্রিয়ের সাহায্য এ অনিষ্টকারিতা হতে তওবা করা জরুরী এবং যথাসময়ে গুনাহ হতে তওবা করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلُ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ۔

অর্থাৎ : আমি তোমাদিগকে যে রিযিক দান করেছি, মৃত্যু আসবার পূর্বে তা ব্যয় কর। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে যদি কিছু অবকাশ দান করতেন তবে আমি ঈমান আনতাম এবং নেক কাজ করতাম। এ আয়াতের তফসীরে লিখিত রয়েছে, মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে মালাকুল মউত যখন রূহ কবয করতে এসে উপস্থিত হবে, তখন মুমূর্ষ ব্যক্তি একদিনের অবকাশ চাইবেন, যেন সে গুনাহ হতে তওবা করতে পারে। মালাকুল মউত বলবে, তোমাকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়েছিল তখন তওবা করনি। এখন তোমার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হয়েছে এখন আর অবকাশের কোন সময় নেই। মুমূর্ষ ব্যক্তি তখন

অতিশয় পেরেশান এবং ভীত হয়ে পড়বে এবং মাত্র এক ঘণ্টার জন্য সময় চাইবে; মালাকুল মউত তাও অস্বীকার করবে। তখন মানুষ ভয়ানক বিচলিত হয়ে যায়। মালাকুল মউত সেই অবস্থায় রূহ্ কবয করে নিয়ে যায়। লোক গুনাহ্গার হলে তাকে দোযখের হুকুম দেয়া হয় এবং নেককার হলে বেহেশতের হুকুম দেয়া হয়। যারা সারা জীবন গুনাহে লিপ্ত থাকে এবং সময় থাকতে তওবা করেনা মুমূর্ষ সময় তাদের তওবা কোনই কাজে আসবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন : যারা গুনাহে লিপ্ত থাকে, এমনকি মুমূর্ষ সময়ে বলে, আমি এখন তওবা করছি, তাদের তওবা কবুল হবে না।

তওবার গুরুত্ব

তওবার গুরুত্ব অসীম। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াত এবং অগনিত হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে, এটা একটি অপরিহার্য ফরয। যেমন আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন :

تُوبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থাৎ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, যাতে করে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পার।" (সূরা : নূর, আয়াত : ৩১)

অন্য এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ـ

অর্থাৎ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর-নিষ্ঠাপূর্ণ তওবা।" (সূরা : তাহরীম, আয়াত : ৮)

তওবার ফযিলত সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

অর্থাৎ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে আত্মরক্ষাকারীগণকে ভালোবাসেন।" (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২২২)

হাদীছ শরীফে রয়েছে : কোন মোমেন যখন তওবা করে তখন আল্লাহ পাক কীরূপ খুশী হন তা তোমরা এই দৃষ্টান্তটি দ্বারা অতি সহজেই বুঝতে পারবে। দৃষ্টান্তটি হল : কোন লোক ঘটনাক্রমে একটি বিজন মরু ভূমিতে উপস্থিত হল। সেখানে হাজার ভয়ভীতি বর্তমান।

আর হযরত মুহাম্মদ (স) বলেন : "তওবাকারী আল্লাহ্র বন্ধু; তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায় পবিত্র।"

এ লোকটি যখন ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল তখন তার খাদ্য ও পানীয় সহ আরোহণের জন্তুটি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। লোকটি জাগ্রত হয়ে উক্ত জন্তুটিকে না দেখে ভীষণ চিন্তিত হল এবং বহু খোঁজাখুজি করেও কোন সন্ধান না পেয়ে সে বুঝল যে, মৃত্যু তাঁর অবধারিত। এরপর ক্লান্ত-শ্রান্ত ও হতাশ হয়ে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঘুম ভাংগার পরেই দেখল যে তার হারানো উটটি তার শিয়রে দাড়িয়ে আছে। এ ব্যক্তির এ অবস্থায় যে আনন্দ হয় তার কোন সীমা থাকে কি? কোন বান্দা যখন তওবা করে তখন আল্লাহ রহমানুর রাহীম তার চেয়েও অধিক আনন্দিত হয়ে থাকেন।

হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে : আল্লাহ পাক যখন হযরত আদম (আ)-এর তওবা কবুল করেন তখন ফেরেশতারা তাকে মোবারকবাদ জানালেন। এবং হযরত জিব্রাঈল ও হযরত মিকাঈল এসে বললেন : আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করেছেন : আপনার আশা পূর্ণ হয়েছে এবং আপনার চক্ষু শীতল হয়েছে। হযরত আদম (আ) তাদেরকে বললেন : আচ্ছা, আমি কি জানতে পারি যে, তওবা কবুল হওয়ার পরে আমার মকাম ও অবস্থান কোথায়? তখন অহী এলো : হে আদম, তোমার সন্তান-সন্তুতিদের জন্যে আমি দু:খ-কষ্ট নির্ধারিত করে দিয়েছি, আর তোমার সূত্রে তারা তওবার উত্তরাধিকারও তারা লাভ করবে।

তাই তাদের যে কেউ আমার নিকট তওবা করবে, আমি তা অবশ্যই কবুল করে নেব; এ ব্যাপারে আমি কোন কার্পণ্য করবো না। ...হে আদম, আমি হাশরের মাঠে তওবাকারীকে এমন অবস্থায় উঠাবো যে, সে আনন্দে হাসতে থাকবে। আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করবো।

হযরত মুহাম্মদ (স) ইরশাদ করেন : "যে ব্যক্তি রাত্রি রাত্রিকালে পাপে লিপ্ত হয় তার পাপ ক্ষমা করার জন্যে আল্লাহ পাক হস্ত প্রসারিত করে তাকে সমস্ত দিন ডাকতে থাকেন। আর দিবাভাগে যে ব্যক্তি পাপ করে তাকে সারারাত ধরে ডাকতে থাকেন। এভাবে মাগরিব থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ্র ডাক অব্যাহত থাকে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা)-কে একটি লোক প্রশ্ন করেছিল : একটি লোক তওবা করতে চায়। তার তওবার কোন সুযোগ আছে কি? এ প্রশ্ন শুনে তিনি অন্য দিকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্রু বর্ষণ করতে করতে তাকে বললেন : বেহেশতের একটি দরজা বাদে সবগুলো দরজা কখনো খোলা হয় এবং কখনো বন্ধ করা হয়। আর একটিমাত্র দরজা এমন রয়েছে, তা কখনো বন্ধ করা হয় না। সর্বদা সেখানে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। অতএব নেক আমল ও এবাদাত বন্দেগীর ব্যাপারে কখনো হতাশ

হয়ো না। বনী ইসরাঈল কওমের একজন লোক প্রথমে ২০ বছর ধরে আল্লাহ্‌র ইবাদাতে লিপ্ত থাকে এবং পরবর্তী বিশ বছর সে আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে মশগুল হয়। একদিন সে আয়নায় তার দাড়ি যে পাকা শুরু করেছে তা লক্ষ্য করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করল :

প্রভু হে, বিশ বছর আমি তোমার ইবাদাত করেছি এবং তারপরের বিশ বছর তোমার নাফরমানীতে লিপ্ত রয়েছি। এখন যদি আবার তোমার নিকট ফিরে আসি তবে তুমি আমার তওবা কবুল করবে কি? তখন গায়েব থেকে আওয়ায এল : তুমি আমাকে ভালোবেসেছ, আমিও তোমাকে ভালোবেসেছি।

আবার তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করেছি। তবে আমি তোমাকে অবকাশ দিয়েছি; তোমার উপর কোন আযাব নাযিল করি নি। এখন যদি তুমি আমার দিকে ফিরে আস, তবে আমিও তোমার তওবা কবুল করে নিব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : হযরত মুহাম্মদ (স) বলেন : "বান্দা যখন তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং যে ফেরেশতারা গোনাহ লিপিবদ্ধ করেন তাদেরকে গোনার কথা একদম ভুলিয়ে দেন। এবং তওবাকারী যে অংগপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে পাপ করেছে আসমান-জমিনের যে স্থানে উক্ত পাপ করছে-সব কিছুকেই উক্ত পাপের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্তিত করে কেয়ামতের ময়দানে তওবাকারীর বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য দিতে না পারে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "কিয়ামতের দিন কিছু লোক নিজেদেরকে তওবাকারী বলে দাবী করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট তাদেরকে তওবাকারী বলে গণ্য করা হবে না। কেননা তারা তওবার সঠিক নিয়ম অবলম্বন করে নি। দুনিয়াতে তারা বাহ্যিক ভাবে তওবা করেছে। কিন্তু গোনাহর জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়নি। ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় সংকল্পও গ্রহণ করে নি, যার উপর জুলুম করেছে তার নিকট ক্ষমাও চায়নি। তার হকও আদায় করে নি। অথচ তাদের জন্যে এরূপ করার সুযোগ ছিল।

অবশ্য চেষ্টা সত্ত্বেও যদি হক আদায় করতে না পারে এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট ইস্তেগফার ও কল্যাণ প্রার্থনা করে, তা হলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক মজলূম বা পাওনাদারকে সম্মত করায়ে তওবাকারীকে রেহাই দিবেন। এ ক্ষেত্রে আরো স্মরণ রাখা উচিৎ যে, সবচাইতে বড় বিপদ হচ্ছে, পাপ করে এমনভাবে ভুলে যাওয়া ও গাফেল হয়ে যাওয়া যে, তওবার কথা আদৌ অন্তরে জাগ্রত হয় না। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ হবে নিজ আমলের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং হঠাৎ করে গোনাহ হয়ে গেলে সংগে সংগেই তওবা করা।"

ফকীহ্ আবুল লাইস (র) বলেন : একদা এক ব্যাক্তি সাংঘাতিক একটি গোনাহ্ করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা পাবে কিনা এ ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট আসে। কিন্তু কী গোনাহ করেছে তা লজ্জায় বলতে পারছিল না। পরিশেষে আল্লাহ্র রাসূল বললেন : মহান আল্লাহ বড় বড় গোনাহ্ও মাফ করে দেন। এরপর নবীজী (স) প্রশ্ন করলেন : তুমি কি গোনাহ করেছ, আমাকে বল। সে বলল : হুযূর! তা প্রকাশ করতে আমার দারুণ লজ্জা হয়। হযরত মুহাম্মদ আবার তাকে বলার জন্য হুকুম দেন। সে বলল : আমি বিগত সাত বছর যাবৎ কাফন চুরি করে আসছি।

কিছুদিন পূর্বে একজন আনসারী যুবতীর মৃত্যু হয়। তার কবর কুড়ে তার কাফন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় শয়তানের কুমন্ত্রণায় আমি তার সাথে যেনায় লিপ্ত হই। এরপর কিছুদূর যেতে না যেতেই উক্ত যুবতী কবর থেকে দাড়িয়ে বলল : ওহে যুবক, তুই ধ্বংস হয়ে যা। তোর কি মহাবিচারকের ভয় নেই? তিনি তো মযলূমের পক্ষ হয়ে যালেমের প্রতিশোধ নেবেন। তুই আমাকে অসংখ্য মৃত ব্যক্তির সামনে লজ্জা দিলি এবং আল্লাহ্র সামনে আমাকে অপবিত্র অবস্থায় দাড় করালি।'

এ কথা শুনে হযরত মুহাম্মদ (স) সংগে সংগেই তার ঘাড় ধরে বের করে দিলেন এবং বললেন : হে ফাসেক, তুই তো জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করেছিস। এরপর যুবকটি আল্লাহ্র নিকট তওবা করতে করতে বের হয়ে গেল। দীর্ঘ ৪০ দিন ধরে আল্লাহ্র কাছে কান্নকাটি করার পর দোয়া করলেন : হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ, আদম ও ইবরাহীমের আল্লাহ, তুমি যদি আমাকে মাফ করে দিয়ে থাক তবে এ সংবাদ হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাহাবীদেরকে জানিয়ে দাও। আর যদি মাফ করে না থাক, তবে আসমান থেকে অগ্নি বর্ষণ করে আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দাও এবং আখেরাতে তোমার শাস্তি থেকে বাঁচাও। এরপর হযরত জিব্রাঈল (আ) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার রব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞেস করেছেন যে, দুনিয়ার সমস্ত মাখলূক কি আপনি সৃষ্টি করেছেন, না আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন?

হযরত মুহাম্মদ বললেন : আল্লাহ্ই আমাকে এবং তামাম জাহানকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনিই সকলের রিযিকদাতা। হযরত জিব্রাঈল বললেন, আল্লাহ পাক বলেছেন যে, তিনি সেই যুবককে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারপর হযরত মুহাম্মদ (স) সেই যুবককে ডেকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন।

হযরত মূসা (আ)-এর কোন একটি লোকের অবস্থা ছিল এটাই, সে তওবা করে অবিচল থাকতে পারত না। তওবার পরক্ষণেই সে তার বিপরীত কাজে

লিপ্ত হয়ে যেত। বিশ বছর ধরেই তার এ অবস্থা চলে। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ)-এর নিকট অহী পাঠালেন : হে মূসা, এ বান্দাকে বলে দাও, আমি তার উপর অসন্তুষ্ট।

হযরত মূসা (আ) যখন তাকে এ খবর পৌছালেন তখন সে খুব মর্মাহত হয়ে এক জনমানবহীন প্রান্তরে চলে গেল এবং সে বলতে লাগল : প্রভু হে, তোমার অন্তহীন দয়া কি শেষ হয়ে গেছে। না আমার না-ফরমানি তোমার কোন ক্ষতি করতে পেরেছে? তোমার অফুরন্ত মাগফেরাতের ভাণ্ডার কি খালি হয়ে গেছে, না তুমি মাগফেরাতের ক্ষেত্রে কৃপণতা করছো? বান্দার কোন পাপ কি এমন আছে যা তোমার আদি-অন্তহীন দয়া ও ক্ষমার চাইতে বড়? পাপ করাত বান্দার স্বভাব, এটা তোমার অন্তহীন মহিমাকে অতিক্রম করতে পারে?

না, তা কিছুতেই নয়। তুমি যদি তোমার বান্দার প্রতি রহমত করা বন্ধ করে দাও, তবে সে কার কাছে আশা করবে? তুমি যদি তাকে নিরাশ করে দাও তা হলে সে আর কার দুয়ারে গিয়ে দাড়াবে? তোমার এ দুর্ভাগার জন্য যদি তোমার দয়া ও ক্ষমার দরজা বন্ধ হয়ে থাকে, আর যদি শাস্তির ফয়সালাই আমার জন্য হয়ে থাকে তা হলে তোমার সমস্ত বান্দার শাস্তি একা আমাকেই দাও; আমি সেই আজাব সকলের পক্ষ থেকে একাই বহন করব। তখন আল্লাহ্ পাক হযরত মূসার নিকট অহী পাঠালেন : হে মূসা, তুমি আমার সেই বান্দার নিকট গিয়ে বল: তুমি যদি সমস্ত দুনিয়া ভরেও পাপ করে থাক তবে তা অবশ্যই আমি ক্ষমা করে দিলাম। কেননা তুমি আমার ক্ষমতা ও দয়ার গুণ সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছ।

হযরত মুহাম্মদ (স) ইরশাদ করেন : "আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আওয়ায হচ্ছে গোনাহ্ করার পর সেই তওবাকারীর আওয়ায যে আল্লাহ্কে ডেকে বলে : ইয়া রব! এ সময়ে আল্লাহ্ বলেন : আমি হাজির, হে আমার বান্দা! তুমি যা ইচ্ছা কর, আমার কাছে চাও। তুমি আমার কোন কোন ফেরেশতার সমতুল্য। আমি তোমার ডানে, বামে, উপরে অর্থাৎ সবদিকেই আছি। আমি তোমার অন্তরের অন্তস্থলেরও নিকটবর্তী। হে আমার ফেরেশতাকুল! তোমরা সাক্ষী থাক আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম।"

উৎবাহ্ নামক একজন যুবক অনাচার, ব্যভিচার ও মদ্যপানে খুব অভ্যস্ত ছিল। এজন্যে সমাজে সে অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল। একদিন সে হযরত হাসান বসরী (র)-এর মর্মস্পর্শী ওয়াজে মুগ্ধ হয়ে সেই যুবক বলল : হে আল্লাহ্র প্রিয় বন্ধু! আমি একজন জঘন্য পাপী। আমার মত নাফরমানের তওবা কি আল্লাহ্ কবুল করবেন? উত্তরে তিনি বললেন : নিশ্চয়ই তোমার গোনাহ্ ও নাফরমানি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তোমার তওবা কবুল করবেন। তখন উক্ত যুবকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে

গেল। দেহ্ তার কাঁপতে শুরু করল। সে চিৎকার করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আসার পর হ্যরত হাসান বসরী তার আরো নিকটে গিয়ে কবিতার কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করলেন।

তার সারমর্ম ছিল : ওহে নাফরমান যুবক! মহা আরশের অধিপতি আল্লাহ্র না-ফারমানির শাস্তি কি? তা তুমি অবশ্যই জানো; তোমাকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। যেখানে থাকবে ভয়ঙ্কর গর্জন। ভীষণ ক্রোধের সাথে বন্দী করে হেঁচড়িয়ে তোমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব তুমি যদি সেই অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার শক্তি রাখ, তা হলে আল্লাহ্র নাফরমানী করতে থাক। নতুবা এখনি নাফরমানি ত্যাগ কর। তুমিতো গোনাহ্ করে শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির জালে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছ। এখনো সময় আছে। ত্রাণ লাভের চেষ্টা কর। এ কথা শুনে যুবক পুনরায় চিৎকার দিয়ে বেহুস হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে আসার পর সে বলল : হ্যরত! আমার মত দুর্ভাগার তওবা কি আল্লাহ্ কবুল করবেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই কবুল করবেন। সে যুবক মাথা উঠিয়ে তিনটি দোয়া করল : (১) হে আল্লাহ্, আপনি যদি দয়া করে আমার তওবা কবুল করেন আমাকে তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও প্রচুর স্মরণশক্তি দান করুন যাতে করে উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে সর্ববিধ ইলম পবিত্র কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হই। (২) হে আল্লাহ্, আমাকে সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করুন-যাতে করে একজন পাষাণহৃদয় ব্যক্তিও আমার তেলাওয়াত শুনে আকৃষ্ট হয় এবং তা অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। (৩) হে আল্লাহ্, আমাকে হালাল রুজি দিন এবং ধারণাতীতভাবে আমার মদদ করুন।

আল্লাহ্ পাক যুবকের এ তিনটি দোয়াই কবুল করে নেন। ফলে তার প্রজ্ঞা ও মেধা হয়েছিল অপরিমেয়, তার তেলাওয়াত শুনে যেকোন নিষ্ঠুর লোকও তওবা করত এবং প্রত্যহ তার ঘরে দু'টি রুটি ও এক পেয়ালা তরকারী পাঠিয়ে দেয়া হত। এ খাদ্য কোথা থেকে এবং কিভাবে আসত, আর কে-ইবা তা পৌছাত সে সম্বন্ধে যুবক কিছুই বলতে পারত না। এ অবস্থা তার মৃত্যু পর্যন্তই জারী ছিল।

তাওবার হাকীকত

তওবা আল্লাহ্কে চিনবার উপায়। তওবা দ্বারাই নেকী-বদীর পার্থক্য হয়ে থাকে। মানুষ যখন গুনাহ্ করতে করতে শেষ স্তরে পৌছিয়া যায়, তখন স্বভাবত:ই তার লজ্জা ও অনুতাপ উপস্থিত হয়। মানুষের বিবেক এক সময় অবশ্যই সজাগ হয় এবং নিজ গুনাহ্ তাকে বিষের ন্যায় দংশন করতে থাকে। সেই বিষ জ্বালা শান্ত করবার জন্য মনে অস্থিরতা দেখা যায়।

সারাজীবন যে বিষ গলধকরণ করেছে তার জন্য মনে অনুশোচনা ও অনুতাপ উপস্থিত হলে সে নিজের বিবেকের নির্দেশেই হোক বা কারো সৎ পরামর্শই হোক অনুতপ্ত হয় এবং ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করে সরল-সোজা ও ন্যায় পথ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়। অনুতপ্ত হয়ে পাপ পথ পরিত্যাগ করার এ সংকল্পের নামই তওবা। পীরের পাগড়ীর এক প্রান্ত হাতে ধরে মুখে তওবার কলেমা পাঠ করার সাথে যদি অন্তরের কোন যোগ না তাকে তবে তা তওবা বলে গণ্য হবে না।

তওবা কিভাবে করব

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিগণ বলেছেন : আটটি কাজ এমন রয়েছে যাতে গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। তার মধ্যে চারটি হচ্ছে এই : (১) তওবা করা অথবা তওবার এরাদা (ইচ্ছাপোষণ) করা। (২) ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা। (৩) গুনাহের কাজে আল্লাহর আযাবের ভয় করা। (৪) আল্লাহর রহমতের প্রতি ভরসা করা। উপরোক্ত চার প্রকারের কাজ মনের সংকল্প বা ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরূপ চারটি কাজের সম্পর্ক শরীরের সাথে রয়েছে :

(১) দু'রাকাত নফল নামায আদায় করত: সত্তর বার তওবা ইস্তেগফার পাঠ করা এবং একশত বার।

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ ـ

"সুবহানাল্লাহিল আযীমে ওয়া বিহামদিহী" পাঠ করা এবং সম্ভব হলে একটি রোযা রাখা। এ সকল নামায মসজিদে পড়া উত্তম, তবে সম্ভব হলে গৃহেই পড়বে। তবে গোপন গুনাহের কাফ্ফারা গোপনেই আদায় করা ভাল। গুনাহ যদি প্রকাশ্য হয় তবে তওবাও প্রকাশ্যে করবে।

কান্নাকাটি ও বিনয়

গুনাহের তওবার বেলায় তওবার বাক্যই শুধু মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়। গুনাহ খণ্ডনের জন্য আল্লাহর নিকট সকাতরে ফরিয়াদ করবে, মিনতি সহকারে সম্ভবমত চোখের পানি বিসর্জন দিবে এবং সম্ভব মত সবকিছুই করবে।

হযরত আবু ওসমান মাগরেবীর নিকট তার এক মুরশিদ জানাল যে, কোন কোন সময় তার যিকির করতে বিরক্তি ভাব এসে পড়ে। তিনি তদুত্তরে বললেন, "অন্তত: তোমার জাহেরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যিকির করছে। এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। শয়তানের উসকানীতেই এরূপ বিরক্তি ভাবের উদয় হয়ে থাকে। শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় প্রবেশ করে থাকে। সে তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হতে বিরত করতে চায়।"

তওবা না করবার কারণ

গাফলতি, নাফরমানী এবং গুনাহ হতে ফিরবার একমাত্র পন্থা হল তওবা। অথচ সেই তওবা কেন করা হয় না এবং কেন এতে নানা ওযর ও গড়িমসি এসে পড়ে, সেই কারণগুলো জানা একান্ত দরকার। তওবা করতে ইচ্ছুক মনের তদারকী করা দরকার। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, কতিপয় কারণে মানুষ তওবা হতে দূরে থাকে এবং গাফলতি করে। তার প্রতিকারের ও বিভিন্ন উপায় রয়েছে। তওবা না করার কারণসমূহের মধ্যে তাও একটি কারণ হতে পারে যে, আখিরাতের প্রতি অথবা আল্লাহর দ্বীনের প্রতি কোনও ঈমান নেই।

অথবা দ্বীন ও ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থার অভাব। অথবা নফসের তাবেদারিতে এতই লিপ্ত যে, তওবা করার সাহসই হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ দুনিয়াদারীতে এতই মশগুল হয়ে পড়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই তওবা হতে গাফেল থাকবার কারণ।

তওবা না করবার আরো কারণ এটাই যে, আখিরাতকে অনেক দূরে মনে হয়। তা ঈমান ও ই'তেকাদের সাথে জড়িত। আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহর ভয়ভীতি অন্তরে সঞ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার আগ্রহ জন্মে না।

তওবা করা সম্পর্কে মানুষের চরিত্রের দীর্ঘ-সূত্রিতা এসে পড়ে, মনে ধারনা হয় একদিন অবশ্যই তওবা করব : পীরের হাতেই তওবা করব। তখন মনে শয়তানের ওসওয়াসার উদয় হয়, তওবা করলে অমুক কাজ বাদ দিতে হবে শরীয়তের সব হুকুম আহকাম পালন করতে হবে তা বড়ই কঠিন মনে হয়। ইত্যাকার কারণে তওবায় বিলম্ব ঘটে থাকে। এরূপ গড়িমসির মধ্যে অনেকেরই জীবন যায় জীবনে তওবা আর নসীব হয় না।

উপরোক্ত অবস্থাগুলো মানুষের তওবার পথে বাধা হয়ে থাকে। বাধা যতই থাকুক আল্লাহর দরবারে নাজাতের আশা করলে এ সকল দুর্বলতা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। জাগ্রত ব্যক্তিকে কে জাগাতে পারে? তওবা তো তারই যার ঈমান আছে। কবর, হাশর, আযাব, সওয়াব, নেকী-বদী, জান্নাত, দোযখ প্রভৃতি আখিরাতের প্রতি যার ঈমান আছে। সেই তো তা চিন্তা করবে। যে ঐ সকল জিনিসের প্রতি ঈমান হারিয়েছে তার তওবা নসীব হওয়ার আশা কোথায়?

মোটকথা, নিজের মনের দুর্বলতা ও শয়তানের কঠিন ওসওয়াসা হতে উদ্ধার পেতে হবে। এটাই ঈমানদারের কাজ এবং ঈমানের লক্ষণ। মনকে একান্ত প্রস্তুতি করতে না পারা যায়, তবে নেককার লোকের সাথে উঠা-বসা করবে। তাদের নসীহত শ্রবণ করবে নিজের মৃত্যু চিন্তা করবে কবরস্থানে মাঝে মাঝে

যাতায়াত করবে। এতে আখিরাত সম্পর্কে দীল সজাগ হবে এবং তওবার ইচ্ছা জাগ্রত হবে। নানা প্রকারের গুনাহে লিপ্ত থাকলে যেকোন একটি হতে তওবা সহজ হলে তাই করবে। এভাবে একটি একটি করে গুনাহ বর্জন করতে তাকবে। তবে তওবার আসল উদ্দেশ্য হলো সব গুনাহ এবং গাফলতি হতে তওবা করা। যদি এক সাথে সবগুলো গুনাহ্ ত্যাগ করা সহজ না হয় তবে একটি করে বর্জন করার জন্য তওবা করবে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন : "আল্লাহ্ তায়ালা তওবাকারীদিগকে ভালোবাসেন।"

তওবার করার শর্ত

গুনাহ্ করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলে তখন লোকে তওবা করে থাকে। তওবার ফল ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। অর্থাৎ সর্বদা মনে অনুতাপ এবং লজ্জা জাগরিত হতে থাকে। মনে মনে নিজকে গুনাহ্গার ধারণা হয় এবং আখিরাতের ভয় বৃদ্ধি পায়। সর্বদা কাজে-কর্মে নিজকে আল্লাহ্র দরবারে দোষী এবং গুনাহ্গার বলে মনে হতে থাকে। হাদীস শরীফে তওবাকারীর নিকট উঠা-বসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে? কেননা, তওবাকারীর মন গুনাহ্ হতে পাক থাকে। তাদের সাথে মিলামিশায় গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকা যায়।

গুনাহের কাজ নফ্সের নিকট অতি মধুর হয়ে থাকে। তওবা করলে গুনাহের কাজ বিষাক্ত মধুর ন্যায় মনে হয়। গুনাহের কাজে ভয় জন্মে এবং ক্রমান্বয়ে গুনাহের খেয়াল দূরীভূত হয়ে যায়। যেকোন একটি বিশেষ গুনাহ্ সম্পর্কেই যে, এরূপ ধারণা হয় তা নহে বরং অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যে কোন গুনাহ্ সম্পর্কেই এরূপ খেয়াল হতে থাকে যে, অমুক কাজটি আল্লাহ্র নাফরমানী ছিল।

যেমন কেউ কেউ বালেগ হওয়ার পর বহুকাল নামায তরক করেছে কিংবা রোযা তরক করেছে, যাকাত আদায় করেনি। তওবা করার পর তা যথাসাধ্য আদায় করবে। নামায আদায় করবে, রোযাসমূহের ক্বাযা, কাফ্ফারা দেবে সেই সব গাফলতির জন্য যে গুনাহ্ হয়েছে সেজন্য পুন: পুন: তওবা করবে।

এ সকল গুনাহের কথা গোপন রাখাই উচিত। তওবা করার পর যথাসাধ্য নেককাজ করবে এবং মনে মনে আল্লাহ্র নিকট ইস্তেগফার করবে। সগীরা কবীরাহ যে ধরনের গুনাহ্ হোক না কেন, তার কাফ্ফারা আদায় করতে থাকবে। নেক কাজের ফলে বহু গুনাহ্ মিটে যায়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ـ

অর্থাৎ, ঃ নেককাজসমূহ গুনাহ্ মিটিয়ে দেয়।

যদি বিগত জীবনে খুব আমোদ-প্রমোদ এবং আরাম-আয়েশে মগ্ন থেকে থাকে এবং ইবাদত-বন্দেগীতে গাফলতি করে থাকে তবে কষ্ট সহিষ্ণুতা সবর ও ধৈর্য অবলম্বন করে তার প্রতিকারের চেষ্টা করবে এ পথে দুনিয়ার মুহব্বত হ্রাস পেতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, মোমেনের শরীরে কাঁটাবিদ্ধ হলেও তা দ্বারা গুনাহের কাফ্ফারা হতে থাকে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, কোন কোন গুনাহ কেবল কষ্টভোগের দরুন মাফ হয়ে যায়। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেছেন, বড় বড় গুনাহগারকে আল্লাহ বহু কষ্ট মসীবতে ফেলে থাকেন। যাতে তার গুনাহ খণ্ডন হয়ে যায়। সুতরাং পশ্চাতের গুনাহখাতা তওবা ইস্তেগফার এবং কাফ্ফারা দ্বারা গুনাহ খণ্ডন করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ যেহেতু মেহেরবান তিনি তওবাকারী বান্দাহকে ক্ষমা করে থাকেন।

বর্তমান যিন্দেগীতে তওবাকারী তওবার উপর দৃঢ়ভাবে বহাল থাকবে এবং নিয়মিত ইবাদত-বন্দেগী করবে। তওবাকারী ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ়ভাবে তৈয়ার হবে। যেকোন মসিবত এবং আজমায়েশ বরদাশ্ত করবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। গুনাহ হতে সর্বদা দূরে থাকবে। আল্লাহর হুকুম আহকামের বেলায় গাফলতি বর্জন করবে। খাওয়া পরা সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে করবে। খাওয়া পরার ভোগ বিলাস হতে পরহেযগারী এখতিয়ার করবে। কেননা, যতক্ষণ মানুষ খাওয়া পরার ভোগ বিলাস হতে পরহেযগারী অবলম্বন করতে না পারে ততক্ষণ মানুষ মুত্তাকী হতে পারে না।

তওবা কবুল হওয়ার ৪টি শর্ত

প্রথম শর্ত হল : ان يقلع عن المعصية - ঐ গোনাহ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। এমনটি করলে হবে না যে নিজে গোনাহে মশগুল, অথচ মুখে গোনাহ থেকে তওবার কথা বলছে। একদিকে মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছে এবং অন্যদিকে বার বার লা- হাওলা পড়ছে।

দ্বিতীয় শর্ত হল : ان يندم عليها . ঐ গোনাহ্র কারণে অনুতাপ সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ অন্তরে এমন এক বেদনা সৃষ্টি হওয়া যে, হায়! আমি এ কি অন্যায় করলাম। এর বড় দয়ালু মালিক ও পরোয়ারদিগারের হক আমি কেন আদায় করলাম না। হযরত আশরাফ আলী থানবী (র) বলেন : দোজখ যদি না থাকত, তবুও এত বড় অনুগ্রহ পরায়ণকারী প্রভুর নাফরমানি করা বান্দার জন্য নিশ্চয়ই অভদ্রতা ও মানবতাবিরোধী কাজ বলে পরিগণিত হত। বস্তুত: আল্লাহ পাকের দয়া এত বেশী যে ভদ্র ও সভ্য মানুষের পক্ষে মালিকের বিরোধিতা করা আদৌ উচিত নয়।

তৃতীয় শর্ত হল : اَنْ يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا اَنْ لَايَعُوْدُ اَبَدًا . এমন বলিষ্ট সংকল্প গ্রহণ করবে যে, ঐ গোনাহ জীবনে কস্মিন কালেও পুনরায় করবে না। প্রাণ বের হয়ে গেলেও তার কাছে আর যাবে না। স্মরণীয় যে তওবার সময়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা বলতে হবে। পরে যদি তওবা ভঙ্গ কর তাতে এ তওবার কোন ক্ষতি হবে না। কোন এরাদা করা এক জিনিস এবং ইরাদা ভঙ্গ হয়ে যাওয়া আরেক জিনিস। তাই তওবার সময়ে আন্তরিক ভাবেই তওবা ভংগ না করার এরাদা হওয়া চাই।

এ ভাবে লক্ষ বার তওবা ভঙ্গ হলেও তওবার সময়ে গোনাহ না করতে ইরাদা কল্লে প্রতিবারের তওবাই কবুল হতে থাকবে। তবে কোন সন্দেহ নাই।

পবিত্র হাদীছে রয়েছে, কোন মানুষ যদি বার বার তওবা করে, অন্তর থেকে সংকল্প করে যে, ভবিষ্যতে কখনো আর এ গোনাহ করবে না। কিন্তু পরে যদি তওবা ভেঙ্গে যায় তবে তাকে 'গোনাহ করে যাচ্ছে' বলে গণ্য করা যাবে না। তাকে হটকারী বলেও অভিহিত করা হবে না। এক কথায় তাকে গোনাহগার বলা যাবে না। হযরত মুহাম্মদ (স) বলেন :

مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

অর্থাৎ : "যে ব্যক্তি ক্ষমা চাইল, যদিও সে দিনের মধ্যে একই পাপ সত্তর বার করে তবুও সে (পাপী তার পাপের উপর স্থির) বলে পরিগণিত হবে না।'

(মেশতাতুল মাছাবীহ)

এটা আরিফ বিল্লাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার সাহেবের 'তওবার ফযীলত' নামক পুস্তিকার অংশ বিশেষ।

তওবা কবুল হওয়ার আলামত

যে বান্দাহ একান্ত সরল অন্তকরণে নিজের গুনাহসমূহ স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে তওবা করে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করে থাকেন। গুনাহ-ই আল্লাহ এবং বান্দাহর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। তওবা সেই ব্যবধান দূর করে থাকে মানুষের দীল একখানি আয়নার ছায়া। তা ফিরিশতা জাতীয় উপাদানে সৃষ্টি। মানুষের গুনাহের ফলে তা দুর্বল ও মলিন হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহর পথের আলো হতে ক্রমশ : দূরে সরে যেতে থাকে। খাঁটি তওবা দ্বারা দীলের এ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা বিদূরিত হয়ে যায়। তওবা করবার পর যদি দীল সাফ মানুষ হয় এবং ক্রমশ: দীলের ভাব পরিবর্তন হয়ে থাকে এবং আল্লাহর দিকে মন আকৃষ্ট হয়, নেক কাজের প্রতি মনের আগ্রহ বাড়তে থাকে তবে মনে করবে

তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। তা অতিশয় সৌভাগ্যের এবং নেক নসীবের লক্ষণ মনে করবে। এরূপ তওবা নসীব হওয়ার জন্যই তরিকতের রাস্তা অনুসরণ করতে হয়। তরিকতপন্থী আধ্যাত্মিক উস্তাদের সাহায্য ও সাহচার্য এ পথে সহায়ক হয়ে থাকে।

গুনাহ কঠিন হলেও আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া যাবে না! কেননা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া কুফরী। অবশ্য গুনাহ ভারী হলে আল্লাহর দরবারে গভীরভাবে রোনাজারি করবে। হাদীস শরীফের মর্মে জানা যায়, গুনাহগার লোকও বেহেশতে গমন করবে। তারা ঐ সকল লোক যারা গুনাহ করলেও মনে মনে আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং গুনাহের জন্য শরমিন্দা থাকত।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, সাবান দ্বারা যেমন কাপড় পরিষ্কার করা হয়, নেকী তেমনি গুনাহ ধৌত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) আরো ইরশাদ করেছেন, "ইবলিশ প্রতিজ্ঞা করে বলল, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাহদিগকে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত ধোঁকা দিতে থাকব, যেন কেউই বেহেশতে প্রবেশ করতে না পারে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, আমার ইজ্জতের কসম। আমিও আমার বান্দাহর জন্য তওবার দরজা খোলা রাখব এবং যখন সে তওবা করবে তাকে ক্ষমা করে দেব।

একদিন এক হাবশী রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গুনাহকারী তওবা করলে কি আল্লাহ ক্ষমা করে থাকেন? রাসূলুল্লাহ (স) ফরমায়েছেন, হ্যাঁ। গুনাহ করে তওবা করলে তওবা কবুল হয়ে থাকে। হাবশী তখন চলে গেল, তারপর এক সময়ে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি যখন গুনাহ করেছি, তখন কি আল্লাহ তা দেখেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হ্যাঁ, বান্দাহর সব কাজই আল্লাহ দেখে থাকেন। হাবশী তা শুনে বেহুশ হয়ে পড়ল। অত:পর দেখা গেল যে, তার রূহ বের হয়ে গিয়েছে।

জনৈক বনী ইসরাঈলের একটি ঘটনা

বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক অতি বড় গুনাহগার ব্যক্তি ছিল। সে একজন বড় আলেমের নিকট গিয়ে বলল, হুযূর! আমি ভারী গুনাহ করেছি, নিরানব্বই জন লোককে বেকসুর কতল করেছি। এমতাবস্থায় আমার তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কিনা? আলেম ব্যক্তি বললেন, না, তোমার তওবা কবুল হতে পারে না। তা শুনে সে ব্যক্তি ক্রোধে উন্মুক্ত হয়ে সে আলেমকেও হত্যা করে ফেলল। অত:পর সে ব্যক্তিকে তার তওবা কবুল হবে কিনা এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য খুব

বড় আলেমের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করবার জন্য লোকে পরামর্শ দিল। অত:পর সে অন্য এক আলেমের নিকট গেলে তিনি তাকে দেশ ত্যাগ করে অন্য এক দেশে যাবার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, সেখানে গিয়ে তওবা করলে তার তওবা কবুল হবে।

লোকটি নিজ গুনাহ হতে মুক্তিলাভের আশায় ব্যাকুলভাবে আলেমের পরামর্শ মতে নিজ দেশ ছেড়ে সেই দেশে যাবার জন্য রওনা হল। কিন্তু লোকটি সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌছার পূর্বেই তার মৃত্যু হল। অত:পর তার রূহ নিয়ে ফেরেশতাদের মধ্যে দু'ধরনের মত হল? একদল তাকে বেহেশতি এবং অপর দল তাকে দোযখী বলে দাবি করতে লাগল।

এরপর আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে ফায়সালা করে দিলেন যে, যদি সে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অর্ধেকের চেয়ে বেশি এসে থাকে তবে তার নাজাত হবে, ফেরেশতাগণ পথ মেপে দেখলেন যে, সে ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অর্ধেকের চেয়ে মাত্র এক বিগত পথ এসছে। সুতরাং রহমতের ফিরিশতাগণ তার রূহ নিয়ে গেলেন এবং তাকে আল্লাহ মাফ করে দিলেন।

কি ভাবে বুঝবেন তাওবাহ কবুল হয়েছে

জনৈক মনীষী বলেছেন : তাওবাহ কবুল হয়েছে কী না, তা নিচে বর্ণিত চারটি আলামত দ্বারা বোঝা যায়। যথা : (১) অনর্থক কথা, মিথ্যা বলা এবং গীবত হতে মুখ বন্ধ করা। (২) অন্তরে কারো প্রতি হিংসা ও শক্রতা পোষণ না করা। (৩) অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা। এবং (৪) মরণের জন্য তৈরি থাকা। সর্বদা নিজের গোনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা। আর আল্লাহপাকের বাধ্য হয়ে জীবন পরিচালনা করা।

জনৈক বিজ্ঞ মনীষীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাওবাহ কবূল হওয়ার এমন কোন নিদর্শন আছে কি, যদ্বারা তাওবাহ কবূল হয়েছে কি না বোঝা যেতে পারে? জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ, চারটি নিদর্শন আছে, এর দ্বারা বোঝা যাবে তাওবাহ কবূল হয়েছে কি না। যথা :

(১) খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করা। সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা। অন্তরে তাওবার ভয়-ভীতি পয়দা হওয়া। (২) সকল গোনাহের কাজ পরিত্যাগ করবে। ঝুঁকে পড়বে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি।

(৩) অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের হয়ে যাবে। মগ্ন হবে পরকালের চিন্তায়। এবং (৪) আল্লাহপাক তার রিযিকের যে দায়িত্ব নিয়েছেন, এতে সন্তুষ্ট ও ভরসা করে তার ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা।

বলা দরকার, এই ধরনের মানুষদের প্রতি সাধারণ মানুষদের চারটি দায়িত্ব রয়েছে : (১) সাধারণ মানুষ তাদেরকে মহব্বত করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মহব্বত করেন। (২) সে যেন তাওবার ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, সে জন্য দু'আ করবে। (৩) অতীত গোনাহের জন্য তাকে ভর্ৎসনা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না। এবং (৪) তার সঙ্গ গ্রহণ করবে। তার ভাল দিকগুলো আলোচনা করবে। তাকে সাহায্য করবে। তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবে।

মানুষের আচরণ বড়ই আশ্চর্যজনক

হযরত মুহাম্মদ বিন মুতাররাফ (রা)-এর সূত্রে আল্লাহপাকের বাণী বর্ণিত আছে। আল্লাহপাক বলেন : মানুষের আচরণ বড়ই আশ্চর্যজনক। সে পাপ করে, আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। আবার পাপ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবারও আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। কিন্তু সে পাপ কাজও ছাড়ে না, আবার আমার রহমত থেকেও নিরাশ হয় না। হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সকল গোনাহগারের জন্যই উচিত হলো, আল্লাহপাকের দরবারে তাওবাহ করা। গোনাহের ওপর অটল না থাকা। বলা দরকার, তাওবাকারী দৈনিক সত্তরবার গোনাহ করলেও গোনাহের ওপর অটল রয়েছে বলা যাবে না।

তাওবাহ কবুল হয় মরণের আগে পর্যন্ত

হযরত হাসান বসরী (রহ)। খ্যাতিমান এক আল্লাহর ওলি। তিনি বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন: আল্লাহপাক শয়তানকে দুনিয়াতে ছেড়ে দেয়ার পর সে বললো, হে আল্লাহ! আপনার ইযযত ও সম্মানের কসম করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করব। তখন আল্লাহপাক বললেন : আমার ইযযত ও সম্মানের কসম করে বলছি, মুমূর্ষু অবস্থার আগে পর্যন্ত আমি মানুষের তাওবাহ কবূল করতে থাকব।

অভিশপ্ত শয়তানের আক্ষেপ ও নৈরাশ্য

একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, মানুষ প্রথম একটি গোনাহ করে ঠিকই কিন্তু তা লেখা হয় না। দ্বিতীয় গোনাহও লেখা হয় না। যতক্ষণ না পাঁচটি গোনাহ একত্রিত হয়। এরপর যদি সে একটি নেকি করে, তাহলে পাঁচটি নেকি লেখা হয়। আর এই পাঁচটি নেকির বদলায় তার কৃত পাঁচটি গোনাহ মাফ করে দেওয়া

হয়। অভিশপ্ত শয়তান তখন আক্ষেপ করতে করতে বলতে থাকে, কীভাবে আমি মানুষকে আমার বশে আনব! আশ্চর্য! তার একটি নেকিই আমার সকল শ্রম নষ্ট করে দিল।

হযরত খাজা ফুযাইল (রহ)

একটি দুর্ধর্ষ ডাকাত দল। খাজা ফুযাইল (রহ) ছিলেন তাদের প্রধান। একদিন তারা সিদ্ধান্ত করলো, তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী একটি কাফেলাকে তারা লুট করবে। কাফেলা আসছে...। আসতে আসতে কাফেলা প্রায় তাদের কাছেই এসে গেল। বিষয়টা তারা অবগত হয়েই খুব দ্রুত হাতে তুলে নিল তলোয়ার। সওয়ার হলো ঘোড়ায়। কাফেলা যে পথ দিয়ে অতিক্রম করবে সেই পথের পাশে একটি গোপন জায়গায় গিয়ে তারা কাফেলার অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে রইল। ঐ কাফেলায় মানুষ ছিল অনেক এবং অনেক শ্রেণীর। মুসাফির ছিল, ব্যবসায়ী ছিল, নারী ছিল, পুরুষ ছিল, ছিল শিশু-কিশোরও। পথ চলতে চলতে কাফেলা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর সামনে এগুনো যাচ্ছে না। তারা তাই পথিমধ্যে এক মুসাফিরখানায় বিশ্রাম নিতে থামল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাকাত দল অতর্কিত হামলা করে বসে কাফেলার ওপর।

এমন সময় ঘোড়ার ক্ষুরাঘাত, অস্ত্রের ঝনঝনানি, শিশুদের কান্নাকাটি এবং মহিলাদের আহাজারিতে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করলো, যেন তা মিনি হাশরের মাঠ! কাফেলার লোকেরা আক্রমণের শিকার হয়ে যে যেদিকে পারে সম্পদ-সামান সবকিছু ফেলে কেবল জান নিয়ে পালাল। বর্বর নির্দয় নিষ্ঠুর ডাকাতেরা কাফেলার প্রচুর অর্থ-সম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ডাকাতনেতা খাজা ফুযাইল (রহ) এক কোণে এক লোককে কী যেন পড়তে দেখলেন। তা তাঁর গায়ে সহ্য হলো না। রাগান্বিত হয়ে গেলেন তার কাছে। শুনতে পেলেন তার কণ্ঠ থেকে ভেসে আসছে নিচের এই আয়াতখানার তেলাওয়াত। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন : ....আসেনি কি এখনো সে সময়, যখন মুমিনদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে-ভয়ে কেঁপে ওঠবে?

আল্লাহপাকের কালাম। বরকত এর সীমাহীন। এর বরকতে মুহূর্তের মধ্যেই পাল্টে যেতে পারে একটি জীবন। এমন ঘটনাও আছে প্রচুর। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর জীবনে পরিবর্তন এসেছিল। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন আল্লাহপাকের একটিমাত্র আয়াত শুনেই। আল্লাহপাকের পবিত্র কালামের তেলাওয়াত শ্রবণ হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর অন্তরে তীব্র ঝড় তুলেছিল। ফলশ্রুতিতে তিনি পরিণত হয়েছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম সাহাবী হিসেবে। তিনি এতই উঁচু

মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন যে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : যদি নবুওয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ না হতো তাহলে আমার পরে নবী হতেন হযরত উমর ফারূক (রা)।

যাক ইতিহাসের সেসব কথা। এমনি এক সময়ে যখন খাজা ফুযাইল (রহ) এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করতে শুনলেন, তখন তা তার জীবনে দারুণ রেখাপাত করলো। ফলে পাল্টে গেল তাঁর জীবন। হাত থেকে তিনি অস্ত্র ফেলে দিলেন। ঘোড়াকে ছেড়ে দিলেন। চলে গেলেন তাঁর নেতৃত্বাধীন ডাকাত দলকে ছেড়ে। চলে গেলেন নির্জন কোন জায়গায়। জনমানবশূন্য সেই জায়গায় গিয়ে শুরু করলেন হাউমাউ করে কান্না। কান্না আর কান্না। এই যে কান্না শুরু হয়েছে যেন এই কান্নার আর বিরতি নেই। অতীত জীবনের কৃত গোনাহের কথা মনে করে অনেক অনেক কাঁদলেন। ক্ষমা চাইলেন আল্লাহপাকের দরবারে। করলেন তাওবাহ। বেছে নিলেন ওই নির্জন স্থানকেই নিজের আবাসভূমি হিসেবে।

কিছুদিন পরের ঘটনা। একটি কাফেলা পথ চলছে...। নির্দিষ্ট স্থানে এসে তারা নিজেদেরকে ডাকাতদল হতে নিরাপদ রাখতে খুবই সাবধানে পথ চলছে। বিশেষ জায়গায় এসে তারা দেখতে পেল, এখানে একজন আল্লাহর বান্দা যিকির-ইবাদতে মগ্ন রয়েছেন। কাফেলার লোকেরা তার কাছে জানতে চাইল, হযরত! আপনি ফুযাইল সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন? সে কি এখন এখানেই কোথাও আছে, নাকি অন্য কোথাও ডাকাতি করতে গিয়েছে? জবাবে ঐ আল্লাহওয়ালা বললেন : তোমরা এখন থেকে আর ফুযাইলকে ভয় করো না। তাকে ভয় করার কোন কারণ নেই। কারণ সে নিজেই এখন মহান এক সত্তাকে ভয় করে। সেই সত্তার ভয়েই সে তার সময় কাটায়।

তারও পরের কথা। হযরত ফুযাইল রহ.-এর জীবনী থেকে জানা যায়, পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর তিনি খুঁজতেন শুধু সেসব কাফেলাকে, যাদের অর্থ-সম্পদ তিনি লুটপাট করেছিলেন। যখনই কোন কাফেলার সন্ধান পেয়েছেন, তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন তাদের থেকে লুটপাটকৃত সম্পদ। এবং মাফ চেয়েছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : এরপর তাকে ভাল-মন্দের জ্ঞান দিয়েছেন। যে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে, সে হয় সফল এবং যে নিজেকে কলুষিত করে সে হয় ব্যর্থ-ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহপাক মানুষকে ভাল-মন্দের জ্ঞান দিয়েছেন। বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ এবং আসমানী কিতাব নাযিল করে দেখিয়েছেন সরল ও সঠিক পথের সন্ধান। বলেছেন, আল্লাহ নির্দেশিত সরল ও সঠিক পথে চললে অনন্ত শান্তি ও সুখের ঠিকানা জান্নাত পাওয়া যাবে। সতর্ক করেছেন শয়তানের পথ

সম্পর্কে। বলেছেন, শয়তানের পথে চললে যেতে হবে জাহান্নামে। এখন যে যে পথের অনুসরণ করবে, তার পরিণতি হবে সে হিসেবেই।

তাওবাহে নাসূহা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। রঈসুল মুফাসসিরীন : প্রিয়নবীজীর সাহাবীদের মাঝে তিনি ছিলেন প্রধান কুরআন ব্যাখ্যাকর। তাওবাতুন নাসূহার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন: তাওবাতুন নাসূহা হলো নিচে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের নাম। যথা : (১) কৃত পাপের কথা মনে করে আন্তরিকভাবে লজ্জিত হবে। (২) মুখের ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করবে। (৩) দ্বিতীয়বার পাপকাজে জড়িত না হওয়ার বিষয়ে পাক্কা ইচ্ছা করবে।

আল-কুরআনে তাওবাতুন নাসূহা বিষয়ে বলা হয়েছে : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর দরবারে পাকাপোক্তা তাওবাহ্ করো।

শয়তানও আক্ষেপ করে

জনৈক তাবেয়ী বলেন : কোন গোনাহগার যখন তার গোনাহের পর তাওবাহ করে, আল্লাহপাকের দরবারে চায় ক্ষমা, নিজের গোনাহের জন্য হয় লজ্জিত, তখন এই লজ্জা ও তাওবার কারণে তার মর্যাদা আরো অনেক বেড়ে যায়। সে হয়ে যায় জান্নাতের অধিকারী। অভিশপ্ত শয়তান তখন আক্ষেপ করে বলতে থাকে, হায়! যদি আমি তাকে গোনাহের প্রতি আকৃষ্টই না করতাম,কতই না ভাল হতো তাহলে! (মানে তার সম্মান তো তাহলে আর এত বাড়তো না।)

তিনটি কাজ তাড়াতাড়ি করা উত্তম

(১) নামায। সময় হলেই সাথে সাথে নামায নামায আদায় করে নেয়া উচিত। মুসতাহাব সময় থেকে বিলম্ব করা কিছুতেই ঠিক নয়। (২) মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ্ করা। মৃত্যুর পর যত দ্রুত সম্ভব লাশকে কবরস্থ্ করা উচিত। এবং (৩) গোনাহের পর তাওবাহ করা। এটাও তাড়াতাড়ি করার কাজ। কিছুতেই যেন এমন না হয় যে, তাওবার আগেই সে মারা যায়।

আল্লাহপাকের নিকট তাওবাকারীর সম্মান

তাওবাকারীকে আল্লাহপাক চারভাবে সম্মান দেখান। যথা : (১) তাওবাকারীকে গোনাহ্ থেকে এমনভাবে পবিত্র করেন, যেন সে কোনদিন গোনাহই করেনি। (২) আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীকে ভালবাসেন। (৩) শয়তান থেকে তাকে হেফাযত করেন। এবং (৪) দুনিয়া ত্যাগের আগে (মরণের আগে) তাকে নির্ভয় এবং নিরাপদ করে দেন।

দোযখ অতিক্রম করার সময় তাওবাকারীর অবস্থা

হযরত খালিদ বিন মাদান (রহ্) বলেন : তাওবাকারীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর বলবে, আল্লাহ্পাক তো বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশ করতে হলে দোযখের ওপর দিয়ে চলতে হবে। তখন তাদেরকে বলা হবে : তোমরা দোযখের ওপর দিয়েই চলে এসেছ, কিন্তু তখন দোযখ ঠাণ্ডা ছিল।

মুসলমানদেরকে লজ্জা দেওয়ার ওপর ধমকি

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন : যদি কেউ কোন মুসলমানকে তার কোন দোষের কারণে লজ্জা দেয়, তাহলে সেও দোষী ব্যক্তির সমতুল্য। অর্থাৎ সে যেন নিজেই উক্ত দোষে দোষিত হলো। এবং কেউ যদি কোন মুসলামানের গোনাহের কারণে তার বদনাম ছড়ায় তাহলে সে অবশ্যই মৃত্যুর আগে এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত হবে। করা হবে তার বদনামও।

ইমাম ফকীহ্ আবুল লায়স সমরকন্দী (রহ্) বলেন : কোন মুসলমান কখনো ইচ্ছা করে কোন গোনাহ করে না। গোনাহ্ হয়ে যায় তার থেকে গাফিলতি ও অসতর্কতার কারণে। সুতরাং তাওবাহ্ করার পর তাকে লজ্জা দেওয়ার অর্থ কী?

তাওবাহ্ দ্বারা গোনাহ্ সম্পূর্ণ মিটে যায়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : কোন বান্দা যখন প্রকৃত তাওবাহ্ করে, তখন আল্লাহ্পাক তার তাওবাহ্ কবূল করে নেন। গোনাহ্লেখক ফেরেশতা ও গোনাহ্গারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপের কথা ভুলিয়ে দেন। উদ্দেশ্য, তারা কেউ যেন পাপকাজ সম্পর্কে সাক্ষী দিতে না পারে। এমনকি গোনাহের স্থানও ভুলিয়ে দেন।

আল্লাহ্পাক যখন শয়তানকে অভিশপ্ত করলেন, তখন শয়তান বললো, আমি আপনার ইযযত-সম্মানের কথা কসম করে বলছি, যতক্ষণ আপনার বান্দা জীবিত থাকবে, ততক্ষণ আমি তার বক্ষ থেকে বের হব না। অর্থাৎ তার দ্বারা গোনাহ্ করাতে থাকব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমিও আমার ইযযতের কসম করে বলছি, আমি তার তাওবাহ্ কবূল করতে থাকব।

উম্মতে মুহাম্মদির বৈশিষ্ট্য

অতীতের উম্মতও গোনাহ করতো। তাদের গোনাহের শাস্তি হতো, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করে দেয়া। গোনাহ্গারের ঘরের দুয়ারে অথবা তার শরীরে কুদরতিভাবে লেখে দেয়া হতো, অমুকের ছেলে অমুক এই গোনাহ করেছে। তার তাওবাহ্ হলো এই...। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ

(সা) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদিকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাদের কোন গোনাহ প্রকাশ করে দেয়া হয় না। যখনই কোন বান্দা তার গোনাহের জন্য তাওবাহ করে আল্লাহপাক তার তাওবাহ কবূল করে নেন। গোনাহকে তার মিটিয়ে দেন। যখনই কোন বান্দা তার গোনাহের কারণে লজ্জিত হয়ে বলে : প্রভু হে! আমার দ্বারা গোনাহ হয়ে গেছে। আমি অন্যায় করেছি। অনুগ্রহ করে তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তার এই দু'আ শুনে আল্লাহপাক বলেন: আমার বান্দা গোনাহ করেছে। এখন সে বুঝেছে, তার এক পালনকর্তা আছেন। যিনি ইচ্ছা করলে তাকে সেই গোনাহের কারণে শাস্তি দিতে পারেন। পারেন তাকে মাফও করে দিতে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। যদি কেউ গোনাহ করে অথবা নিজের ওপর যুলুম করে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে সে আল্লাহকে পাবে সীমাহীন দয়াময় ও ক্ষমাশীল। সুতরাং প্রতিটি মানুষের সকাল-সন্ধ্যা নিজের গোনাহের জন্য তাওবাহ করা উচিত।

গোনাহ লেখার আগে নেকির অপেক্ষা করা হয়

প্রতিটি মানুষের ডান-বাম কাঁধে দুজন ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। ডান কাঁধের ফেরশতা বাম কাঁধের ফেরেশতার শাসক বা নিয়ন্ত্রক। মানুষ কোন গোনাহ করলে বাম কাঁধের ফেরেশতা তা লিখতে চায়, কিন্তু ডান কাঁধের ফেরেশতা তাকে বাধা দিয়ে বলে: গোনাহের সংখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত গিয়ে পাঁচে না দাঁড়াবে ততক্ষণ পর্যন্ত লিখবে না। এরপর পঞ্চম গোনাহের পর তা লেখার জন্য সে অনুমতি চায়। ডান কাঁধের ফেরেশতা আবারো বাধা দিয়ে বলে: আরো অপেক্ষা করো, হতে পারে সে কোন একটি নেকির কাজ করবে।

এমন সময় বান্দা যদি কোন একটি নেকির কাজ করে তাহলে ডান কাঁধের ফেরেশতা বলেন : আল্লাহপাকের নীতি-বিধান হলো, প্রতিটি নেকিকে দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া। সুতরাং একটি নেকির জন্য সওয়াব হবে দশগুণ। বলা দরকার, তার গোনাহ হলো মাত্র। সুতরাং পাঁচ নেকির পরিবর্তে পাঁচটি গোনাহ মাফ হয়ে গেল। বাকি পাঁচটি নেকি আমি লিখে নিচ্ছি। এই অবস্থা দেখে অভিশপ্ত শয়তান চিল্লাচিল্লি করে বলতে থাকে। আমি কীভাবে মানুষকে কাবু করতে বা আয়ত্তে আনতে পারব!

তাওবার ফলে গোনাহ নেকিতে পরিণত হয়

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন : একবারের ঘটনা। এশার নামাযের পর আমি কোথাও যাচ্ছিলাম। পথে জনৈক মহিলা আমাকে বললো : আবু হুরাইরা!

আমার দ্বারা অনেক বড় একটি গোনাহ্ হয়ে গেছে। আমি কি তাওবাহ্ করতে পারব? আমি জানতে চাইলাম, কী গোনাহ্ হয়েছে তোমার দ্বারা? বললো : যিনা হয়ে গেছে। যিনার ফলে যে সন্তান জন্ম নিয়েছিল, তাকে আমি মেরে ফেলেছি।

আবু হুরাইরা (রা) বললেন : আমি তার এই কঠিনতম গোনাহের প্রতি লক্ষ্য করে বললাম : তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছ, অন্যকেও ধ্বংস করেছ। না, এখন আর তোমার জন্য তাওবার অবকাশ নেই! মহিলাটি একথা শুনে পরে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। এদিকে আমি চলে গেলাম সামনের দিকে। কিন্তু লজ্জিত হলাম এই ভেবে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই কেন আমি নিজের ধারণা থেকে মাসআলা বলে দিলাম!

পরের দিনের ঘটনা। সকাল বেলায়ই আমি গিয়ে পৌঁছলাম হযরত মুহাম্মদ (সা) এর দরবারে। বললাম হুযূরের কাছে গেল রাতের সব ঘটনা। হুযূর আমার মুখে ঘটনার বিবরণ শুনেই বললেন : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহ্ রাজিউন। আবু হুরাইরা! তুমি নিজে ধ্বংস হয়েছ, ধ্বংস করেছ তাকেও। তোমার কি মনে নেই এই আয়াতখানার কথা?

যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না, যিনা করে না (তারা নেককার)। আর যারা এরূপ করে, তারা গোনাহ্গার। কিয়ামতের দিন তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। অপদস্ত হয়ে তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। কিন্তু যারা তাওবাহ্ করে এবং ঈমান নিয়ে আসে, আর নেক কাজ করতে থাকে, এসব লোকদের গোনাহকে আল্লাহপাক নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন : আমি একথা শুনে সেই মহিলাটির খুঁজে বের হলাম। আর মদীনার অলিতে-গলিতে একথা বলে ঘুরতে লাগলাম, গত রাতে কে আমার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিল? আমার এ অবস্থা দেখে ছেলে-মেয়েরা বলতে লাগল, আবু হুরাইরা পাগল হয়ে গেছে। শেষে রাতের বেলায় ঐ নির্দিষ্ট স্থানেই মহিলাটির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাকে আমি হযরত মুহাম্মদ (সা) এর বাণীর কথা জানালাম। বললাম, তোমার জন্য তাওবার দরোজা খোলা আছে। মহিলাটি আমার কাছে একথা জেনে এতই আনন্দিত হলো যে, সাথে সাথে সে বলে উঠলো, আমার অমুক বাগানটি মিসকীনদের জন্য সদকা করে দিলাম!

জনৈক বুযুর্গ বলেন: তাওবার দ্বারা আমলনামার গোনাহ নেকি দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়, এমনকি কুফর পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :হে নবী! আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন, যদি তারা কুফরী থেকে তাওবাহ্ করে নেয়,

তাহলে তাদের আগের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। কুফর সবচে বড় গোনাহ, তাও তাওবাহ দ্বারা মাফ হয়ে যায়। সুতরাং অন্যান্য ছোট গোনাহ তো অবশ্যই মাফ হয়ে যাবে।

যাযানের তাওবার ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। একদিন তিনি কুফার কোন এলাকা দিয়ে পথ চলছিলেন। পথে দেখলেন কিছুসংখ্যক ফাসেক-দুষ্ট মানুষেরা মদ পান করছে। যাযান নামে এক ব্যক্তি তাদের মাঝে গান পরিবেশন করছে। কণ্ঠ ছিল তার খুবই সুমধুর। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তার কণ্ঠ শুনে বললেন : ইস্, কতইনা সুন্দর তার কণ্ঠ! আহা, যদি সে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতো! কতইনা স্বাদ তাহলে সে পেত! একথা বলে তিনি কাপড় দ্বারা মাথা ঢেকে নিরবে চলে গেলেন। এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যে কথাগুলো বললেন, তা শুনতে পেরেছিল স্বয়ং যাযান। যাযানের কানে এই আওয়ায ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। বললো,তিনি কে এবং কী বলতে ছিলেন?

লোকেরা বললো : ইনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবী। তিনি বলছিলেন : কতইনা সুমধুর তার আওয়ায! যদি সে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতো, তাহলে কতই না মজা হতো!....

কথাগুলো শুনলেন যাযান। শুনলেন মনে-প্রাণে। অমনি ঝড় শুরু হয়ে গেল তার অন্তরজুড়ে। তিনি ভেঙে ফেললেন তবলা। শুরু করলেন কান্না। কান্না আর কান্না....। আর যেন দৌড়ে গেলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কাছে। গিয়েই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। শুরু করলেন এখন দুজনেই কান্না। অনেক্ষণ কাঁদলেন। তারপর....

হ্যাঁ, তারপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন : নিজে আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, আমি কেন তাকে ভালবাসব না? তারপর যাযান তাওবাহ করলেন। তার জীবনের মোড় ঘুরালেন। শুরু করলেন এখন নতুন আলোকিত রাজপথের পথচলা...। সেই কাজ তিনি শুরু করলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কাছে থেকেই। তিনি তার কাছে শিখতে আরম্ভ করলেন কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত। শেষ পর্যন্ত তিনি কুরআন তেলাওয়াত শিখলেন। অন্যান্য বিষয়েও অর্জন করলেন প্রচুর জ্ঞান। পরিণত হয়েছিলেন তিনি শেষে যুগের ইমামে। অনেক হাদীসের সনদেই তাঁর আলোঝলমল নাম চোখে পড়ে। আল্লাহপাক তাঁর প্রতি রহমতের ফুল বর্ষণ করুন।

হযরত মূসা (আ) এর নিকট শয়তানের তওবা

হযরত মূসা (আ)। আল্লাহপাকের নির্বাচিত এক বান্দা। তিনি নবীও ছিলেন, রাসূলও ছিলেন। একবার তার কাছে এসে শয়তান বললো : হযরত! আপনি আল্লাহপাকের মনোনীত রাসূল। আল্লাহপাকের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য আপনি লাভ করেছেন। আমি ইচ্ছা করেছি, তাওবা করবো। দয়া করে আপনি আল্লাহপাকের কাছে সুপারিশ করুন, তিনি যেন আমার তাওবা কবূল করেন।

শয়তান তাওবা করবে! বাহ, কতইনা খুশির খবর! শয়তানই যদি তাওবা করে ফেলে তাহলে আর চিন্তা কিসের? গোমরাহ তাহলে আর কোন মানুষই হবে না। এসব কিছু ভেবে হযরত মূসা (আ) খুবই খুশি হলেন। অযূ করলেন। দাঁড়ালেন নামাযে। নামায শেষ হলে পরে তিনি দু'আয় মগ্ন হলেন। দু'আয় সুপারিশ করলেন শয়তানের তাওবা কবূল করার জন্যে। আল্লাহপাক তখন হযরত মূসা (আ) কে বললেন : মূসা! শয়তান মিথ্যা বলেছে। সে আপনার সাথে প্রতারণা করছে। পরীক্ষা করতে চাইলে তাকে বলুন, সে যেন আদমের কবরে সিজদা করে। তাহলেই আমি তার তাওবা কবূল করে নেব।

হযরত মূসা (আ) খুব খুশি হলেন। খুশি হলেন এই কারণে যে, শয়তানের তাওবা কবূলের জন্য আল্লাহপাক যে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, তা খুবই সহজ। অনায়াসেই সে এই শর্ত মেনে নিতে পারবে। খুশিতে গেলেন তিনি শয়তানের কাছে। গিয়ে বললেন, তাকে আদমের কবরে সিজদা করতে হবে। তাহলেই আল্লাহপাক তার তাওবা কবূল করে নিবেন। হযরত মূসা (আ)-এর কাছে একথা শুনে শয়তান রাগে যেন ফেটে পড়লো। বললো : জীবিত থাকতেই যাকে সিজদা করিনি তাকে মরণের পরে কী করে সিজদা করি? না, এসব আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

তাওবাহ সম্পর্কে হাদীসে কুদসী

হযরত আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : (১) হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের ওপর যেমন জুলুম করা হারাম করেছি, ঠিক তেমনি অন্যদের ওপরও তোমাদের জন্য জুলুম করা হারাম করেছি। (২) হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়েত দান করি, সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা সকলেই আমার কাছে হেদায়েত চাও। আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করবো। (৩) হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে আহার করাই, সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা সকলেই আমার কাছে রিযিক-আহার চাও। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে

আহার দেব। (৪) হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে কাপড় পরিধান করাই, সে ছাড়া তোমরা সকলেই বিবস্ত্র। তাই তোমরা সকলেই আমার কাছে পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে পোশাক দান করবো। (৫) হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিবানিশি গোনাহ্ করো, আমি তা ঢেকে রাখি। সুতরাং তোমরা আমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ক্ষমা করবো। (৬) হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার কোন উপকার করতে পারবে না, পারবে না কোন ধরনের ক্ষতিও করতে। কারণ এই ক্ষমতা তোমাদের নেই। (৭) হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল জিন-ইনসান মিলে সকলেই যদি খোদাভীরু হয়ে যাও, তাতে আমার রাজত্বে সামান্য কিছুও বাড়বে না। (৮) হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের জিন-ইনসান সকলেই মিলে যদি আমার অবাধ্য হয়ে যাও, তাহলে তাতে আমার রাজত্বে সামান্যও কমতি দেখা দিব না। (৯) হে আমার বান্দাগণ! আদম (আ.) হতে কিয়ামত পর্যন্ত সকল জিন-ইনসান একত্রিত হয়ে যদি তোমরা আমার কাছে সওয়াল করতে থাক, আর আমি তোমাদের সকলের চাহিদা পূরণ করতে থাকি, তবে তাতে আমার ভাণ্ডারে এতটুকুও কমতি দেখা দিবে না, যতটুকু সাগরে একটি সূঁচ ডুবিয়ে বের করে আনলে সাগরের পানিতে কমি দেখা দিতে পারে।

গোনাহ্ মাফের একটি খাস আমল

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত রাসূলে পাক (স) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করবার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-কে এ দোয়া শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ দোয়ার বরকতে তিনি আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভ করতঃ আখিরাতে বাদশাহী লাভ করেছেন। অতএব, কোন মুমিন-মুসলমান খালেস নিয়তে নিম্নোক্ত দোয়াটি অধিক পরিমাণে পাঠ করলে আল্লাহ্ পাক তার যাবতীয় গুনাহখাতা মাফ করে দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

---